



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 29 - 46

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

মাধব কন্দলীর রামায়ণে সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন

সাবানা সুলতানা

গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: sabanasultana10@gmail.com



Received Date 15. 06. 2026

Selection Date 15. 07. 2026

Keyword

Assam, Ramayana, Madhava Kandali, Society, History, Culture, Economic, Medieval, Religion, King.

Abstract

Madhava Kandali's Ramayana, written in the 14th century, is a credible paraphrase of Valmiki's Ramayana. In translation, the author's creative liberty is minimal. But the powerful poet Madhava Kandali strategically reflected the culture life of 14th century Assam in his Ramayana. He include local Assamese culture, customs, beliefs and social practices in to his work. Although Madhava Kandali composed the Ramayana under the patronage and at the command of King Baraha Raja Mahyamanikya, his primary objective was to make the immortal essence of Valmiki's Ramayana accessible to the Assamese people who were unfamiliar with Sanskrit language. The depiction of simple, familiar and socially relevant milieue appropriate to the folk society of the 14th century rendered the epic highly appealing to its readers and listeners.

To facilitate his translation, the poet adopted the methods of omission, adaptation and modification, while also incorporating various indigenous elements into the narrative. As a poet serving under a monarchy, Madhava Kandali incorporated the seeds of his own practical experience into the epic while depicting royal affairs, the institute of Kingship and the system of gernance.

The article reflect the medieval Assam social, economic and culture life which also include the caste system, the occupation of the Assamese, their food habits, clothing, ornament, religious beliefs and fold culture. It also emphasizes coeval social realities like economic hardships, social inequalities and belief in the supernatural and astrology. Through vivid descriptions of Assamese life and customs, this article represents that Kandali remodeled the saga into a precious source for understanding the fourteenth century social history and folk culture of Assam. So this Assamese Ramayana represents not only as a literary masaterpiece but also documents the medieval history of Assamese society.

Discussion

ভূমিকা : মানুষ সামাজিক জীব। প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক জাতি তার সামাজিক অভিব্যক্তির ধারক। জাতীর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে ভাব-অনুভূতি, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার-সংস্কৃতি-অন্ধসংস্কৃতি। প্রত্যেক জাতীর থাকে এক সামাজিক ইতিহাস। সময়ের গভীর তলে কখনো কখনো মানবের ইতিহাস হারিয়ে যায়, কিন্তু সময়ের সেই তলদেশ থেকে ইতিহাস মাঝে মাঝে হাতছানি দেয় সাহিত্যের আলোকে। আর সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ। সেই দর্পণে সমাজের চিত্র প্রতিবিম্বিত। সমাজ-সম্পর্কিত জীবন প্রবাহ হল সাহিত্যের প্রেরণা।

মাধব কন্দলী হলেন অসমীয়া ভাষার প্রথম রামায়ণের অনুবাদক। আর তাঁর কাব্য অনুবাদমূলক কাব্য। অনুবাদমূলক গ্রন্থে সাধারণত অনুবাদকের সমসাময়িক সমাজ-জীবনের ছবি ফুটিয়ে তোলার অবকাশ থাকে কম। কিন্তু শক্তিদ্বার সাহিত্যিক সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে কৌশলে তাঁর সমসাময়িক সমাজচিত্রকে অঙ্কন করেন সুচতুরভাবে। তাঁরা জানেন পরিচিত সমাজ চিত্র পাঠকের সঙ্গে লেখকের অন্তরঙ্গতা গড়ে তোলে। প্রতিভাশালী কবি মাধব কন্দলী একজন সমাজ-সচেতন কবি তথা অনুবাদক। তিনি তাঁর অনুবাদ কর্ম করেছিলেন রাজা মহামাণিক্যের আদেশে, সংস্কৃত না জানা সমসাময়িক সাধারণ লোকজীবনের উদ্দেশ্যে। এসম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন

“কবি সব নিবন্ধয় লোক ব্যবহারে
কতো নিজ কতো লম্বা কথা অনুসারে।।
দৈববানী নুহি ইটো লৌকিকহে কথা।
এতেক ইহাৰ দোষ নলৈবা সৰ্বথা।।”^১

অসমীয়া রামায়ণের গবেষক ডঃ বিজয়া বরুয়ার এ সম্পর্কে মতটি উল্লেখযোগ্য -

“কন্দলীর অনুবাদের ঘোষণাটি অত্যন্ত কৌশলপূর্ণ। যদিও কবি মূল বাল্মীকি রামায়ণের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত থেকে অসমীয়া রামায়ণ রচনা করেছিলেন, তিনি সেটিকে অসমীয়া পোশাকে সজ্জিত করে এবং অসমীয়া অলঙ্কারে সাজিয়েই অসমীয়া সমাজজীবনের সামনে উপস্থাপন করেন। এখানেই কবির মৌলিক সৃজনশীল প্রতিভার সাফল্য প্রতিফলিত হয়েছে। অসমীয়া ‘রামায়ণ’ রচনার ক্ষেত্রে তিনি ‘লোক আচরণের’ আদর্শ থেকে এক পা-ও বিচ্যুত হননি। তিনি লোকজীবনের উপযোগী এবং লোকজীবনের ভিত্তিতেই রামায়ণ রচনা করেছেন।”^২

মাধব কন্দলীর রামায়ণে সমসাময়িক লোকজীবন ও সমাজ জীবনের চিত্র পরিস্ফুরণ ঘটেছে। ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রচলিত সমাজ জীবনের সুক্ষ্মতীক্ষ্ণ বিবরণ এ কাব্যের অলংকার। কবি কাব্য রচনা করেছিলেন মূলত ‘সর্বজন বোধে’ আদর্শে। ‘সর্বজন’ তাঁর কাব্যের পাতায় পাতায় স্থানাধিকারী। মাধব কন্দলী তাঁর কাব্য চতুর্দশ শতাব্দীর আসামের মানুষের সামাজিক জীবনচরিত এমন সার্থকভাবে চিত্রিত করেছেন যে - এ কাব্য অনুবাদ কাব্যের বেড়া অতিক্রম করে মৌলিককাব্যে পরিণত। তাঁর কাব্যের সামাজিক দিকগুলি আমরা নিম্নরূপ আলোচনা করব।

শাসন ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা : কবি মাধব কন্দলী তার রামায়ণ রচনার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে লিখেছেন -

“রামায়ণ সুপয়ার
ব্রাহ্মণ রাজার অনুবোধে।”^৩

তিনি মহামাণিক্যের রাজসভাকবি ছিলেন। তৎকালীন আসাম ছিল রাজতন্ত্রের অধীনস্ত। রামায়ণ যেহেতু রাজ-রাজত্বের কাহিনী, কবি সেজন্য শাসনব্যবস্থা বর্ণনাক্ষেত্রে আসামের বাস্তব চিত্রগুলি রামায়ণের রঙে রাঙিয়ে উপস্থাপন করেছেন। রাজ শাসনের নিয়ম-কানুন, রাজকীয় শিষ্ঠাচার, সেবা-সম্মান-অভ্যর্থন, প্রজাপালন ইত্যাদি বিষয়গুলি বাস্তব সম্মত।

রামায়ণের অযোধ্য কাণ্ডে রামের অভিষেকের পূর্বে রাজা দশরথ পুত্র রামচন্দ্রকে রাজ্য শাসন সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন। আপন-পর ভেদাভেদ না করে ছয়গুণে সন্ধি, বিগ্রহ, আবর্ষ (অভিযান) আসন, দ্বৈধীভাব ও সক্ষ দ্বারা রাজ্য পরিচালনা করা, যে সাতগুণ দ্বারা রাজা সার্থক হন সেগুলি -

“আপুনি পালিব রাজ্য আরো মন্ত্রীগণ।

বহুমিত্র করিব সঞ্চিব বহুধন।।

ৰাজ্য দেশ হৈব আনো নানা থান।

ৰাজা ভৈলে কৰিব সৈন্যক বহুমান।।”^৪

মন্ত্রীগণের সাহায্যে রাজকার্য পরিচালিত শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত মিত্র স্থাপন রাজ্যের কোষাগারে বিপুল ধন-সম্পদ সমৃদ্ধ, রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি ইত্যাদির দ্বারা একজন রাজা অপরাজেয় হতে পারেন, সেহেতু সেনাবাহিনী সার্বভৌমত্ব রক্ষাকারী সেন্য তাদের বীরত্বকে সম্মান জানাতে হবে পারিশ্রমিক ও পুরস্কারের মাধ্যমে।

মন্ত্রী বা রাজকর্মীরা রাজ্য শাসনে কত বড় ভূমিকার পালক তা লক্ষ্যকাণ্ডে বিভীষণের একটি উক্তি প্রকাশিত -

“নৃপতিসরব বৃদ্ধি মত্ত হস্তী গত্ত।

নীতি আঙ্কুশে যদি নকরিলে সত্ত।।

মন্ত্রী হৈয়া ৰাজাৰ বিৰুদ্ধে মতি লয়।

মিছাতেসে ভূঞ্জা ৰাজ্য চোৰক আশ্বয়।।”^৫

এই নীতিমূলক উপদেশ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে রাজা যতই শক্তিশালী হোক না কেন তাকে সং নীতি ও শাস্ত্রের আশ্রয়ে থাকতে হবে। রাজকর্মচারীদের দায়িত্ব হল রাজা যদি অন্যায় কার্যে লিপ্ত হয় তাহলে সঠিক ও সত্য দ্বারা রাজ্য ও রাজাকে রক্ষা করা।

যুদ্ধ বর্ণনাক্ষেত্রে মাধব কন্দলীর সুক্ষ পর্যবেক্ষণ প্রশংসনীয়। যুদ্ধের আয়োজনে চতুরঙ্গ সেনা অশ্ব, রথ, হস্তী, পদাতীক সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধযাত্রা, বিভিন্ন যানবাহন, অস্ত্রাদি, ফটক, ধনুর্ধর, সেনাপতি যুথপতির পরিচয়, চব্বিশ প্রকার অস্ত্রের নাম উল্লেখ (কাটারী, কুড়ুল, খড়্গ, মাণ্ডা, গদা, বাণ, ত্রিশূল, নাগপাশ, বজ্র) ইত্যাদির বর্ণনা মূল রামায়ণের অনুরূপ হলেও তৎকালীন আসামের লোকসমাজে ব্যবহৃত বিষয়বস্তু সম্ভাব্য। এক্ষেত্রে মাধব কন্দলীর নৌবাহিনী বা নৌ সেনার উল্লেখ তার বাস্তবতার পরিচায়ক। কারণ প্রাচীনকালে ‘পুরাণা’ দিতে নৌসেনা বা জলপথে যুদ্ধের কথা অনোল্লেখ্য। কিন্তু মাধব কন্দলী মধ্যযুগীয় শাসন (যুদ্ধ) ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি ফুটিয়েন এইভাবে -

“আউর কিবা চার

কোটি সংখ্যা নার

সজায়ো বন্টে আমাৰ।

নকৰিবা দৈন্য

যেন শবসৈন্য

গঙ্গাত নুহিকে পাৰ।।”^৬

মধ্যযুগীয় আসামের আরও একটি যুদ্ধ বৈশিষ্ট্য হল গড় তৈরি করে যুদ্ধকার্য পরিচালনা। রাম-রাবণের যুদ্ধ চলাকালীন রামের সৈন্য দল গড় তৈরি করে এবং সেখান থেকে বেরিয়ে যেভাবে রাবণ সৈন্যদের বিনাশ করে তা আসলে সমকালীন যুদ্ধযাত্রায় বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন।

আর্থ-সামাজিক দিক : মাধব কন্দলীর রামায়ণে তৎকালীন আসামের সামাজিক চিত্র, বর্ণাশ্রম প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। অযোধ্যা কাণ্ডে রামাদির বনগমনের পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নিজ নিজ কর্ম থেকে বিরতি গ্রহণ করেছে।

“ব্রাহ্মণসকলে নপচয় আরো বেদ।

ক্ষত্রে এৰিলেক অস্ত্র কৰ্ম ধৰ্ম

বৈশ্য এৰিলেক কৃষি বাণিজ্যৰ কৰ্ম।

শূদ্রে এৰিলেক সেবা বিষাদিত সমলোক।।”^৭

বর্ণাশ্রম প্রথা নির্দিষ্ট কর্ম দ্বারা চিহ্নিত। ব্রাহ্মণ পূজা-পার্বণ, যজ্ঞাদি, শাস্ত্রীয় কর্মে, ক্ষত্রিয় রাজকার্যে, বৈশ্য কৃষি ও বাণিজ্য কর্মে এবং শূদ্র দাস বা সেবা কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। এই বিশেষ বৃত্তিদারী প্রধান চার বৃত্তি উপরেও কন্দলী রামায়ণে ‘ছত্রিশ’ বৃত্তিদারী জাতি উল্লেখ্য।

“ছত্রিশ জাতিয়ে তেজিলেক নিজবৃত্তি”^৮

এই বৃত্তি সকলের মধ্যে নাচ-গান করা নট-নটী, ভাট, তেলী, তাঁতী, কামার, স্বর্ণকার, শঙ্কারি, বেনে, চামার, সূতার, ধোপা, কুমোর আদি উল্লেখযোগ্য।

তৎকালীন সমাজে নারীরাও যে বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিল তা কন্দলী রামায়ণে উল্লেখ্য। সীতাকে রাম অগ্নিপরীক্ষা দিতে বলায় প্রতিবাদী সীতা বলে ওঠে -

“আমাক ইতর নারী সম দেখিলাহা।

নটর নটিনী যেন আনক বিলাহা।”^{১৬}

এ থেকে বোঝা যায় নটদের মাঝে যৌন শিথিলতা ছিল, সেজন্য সমাজ তাদের কিছুটা অবজ্ঞা করত।

সমাজসচেতন কবি সমাজ জীবনের কথা বলতে গিয়ে অসামাজিক কাজে লিপ্ত বৃত্তিধারীদের কথা বলতে ভোলেননি। কন্দলীর বর্ণনায় -

“কাটিবক লাগি যেন লৈয়া চোর।”^{১৭}

“রাজ্যত বাক্ষিতে সবে লটক তঙ্কর।।”^{১৮}

রামায়ণ রাজ-রাজাদের কাহিনী হলেও সাধারণ দরিদ্র মানুষ পেটের দায়ে নিম্নকর্মেও যুক্ত হত। সে সমাজে সাধারণ বৈশ্য, শূদ্র শ্রেণি তো বটেই ব্রাহ্মণ পর্যন্ত অনাহারে থাকত, মাধব কন্দলী তাঁর উদাহরণ দিয়েছেন -

“পাচে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণে রামক পাইল ভেট।

আমি পাঞ্চ বরিষে রাজ্যত করি জেট।।

শিশুসুত মোহোর বিস্তর পরিজন।

পুষিতে নাপাৰো মোক কিছু দিয়ো ধন।।”^{১৯}

এক্ষেত্রে বোঝা যায় অর্থনৈতিক সচ্ছলতার অভাব তৎকালে ব্রাহ্মণ সমাজেও ছিল বিদ্যমান। অবশ্য রাজপরিবার বা উচ্চবিত্ত পরিবার থেকে বিভিন্ন সময় অর্থনৈতিক অনগ্রসর প্রজারা যে আর্থিক সাহায্য লাভ করতেন তার উদাহরণও কন্দলী রামায়ণে বর্তমান। রামাদির জন্মের পর রাজা দশরথ ব্রাহ্মণদের গাভী, স্বর্ণ, দেশ, দাস-দাসী দিয়ে যেমন সন্তুষ্ট করেছেন তেমনি সাধারণ প্রজাদেরও দান-ধ্যানে লিপ্ত থেকেছেন। রামাদির বিবাহের পরও রাজা জনক ও দশরথকে প্রজারঞ্জন করতে দেখা যায়। পিতার মৃত্যুর পর ভরত, রাজ্যভিষেক পর রামচন্দ্র এই কর্মে লিপ্ত - সেখানে রামচন্দ্র বন্ধুজন, নট, ভাট, দাস-দাসীর মনোরথ পূরণ করেন এবং ব্রাহ্মণ রামের থেকে ধন নিয়ে -

“যজ্ঞ করিবোঁহো বুলি মাগি লৈলা ধন।

রামক আশীষ করি চলিলা ব্রাহ্মণ।।”^{২০}

রামায়ণে সমাজ ছিল পুরুষ প্রধান। পুরুষদের একাধিক বিবাহের সাক্ষ্য দেয় দশরথ ও রাবণের বহুপত্নীগণ। তবে সে সমাজেও যে নারী স্বাধীনতা ছিল তা বোঝা যায় কৈকেয়ীর একাধিপত্যে এবং সীতার গাষ্ঠীর্ষে। বনবাস কালে রামচন্দ্র সীতাকে সঙ্গী করতে অস্বীকার করলে সীতা নানা বিচার বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ করে যেভাবে রামের অনুগামী হয়েছেন তা নারীত্বের জয় ঘোষণা। আবার এই সীতা দেবী রুদ্রমূর্তী ধারণ করেছেন লঙ্কাকাণ্ডে অগ্নিপরীক্ষা কালে।

“তুমি যেন শক্তি আমি নহো হেন ঠান।

দেব ধর্ম সাক্ষী হুইবা পৃথিবী প্রমাণ।।

অন্তর্গত শুদ্ধ আমি হোঁও মহাশক্তি।

ইতর পুরুষ যেন লঘু বোল মতী।।”^{২১}

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস : মানবের জীবনে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান অপরিহার্য। মাধব কন্দলী রামায়ণ কাব্যে সার্বিক মানবের চিত্র অঙ্কণ কালে এ বিষয়গুলি উল্লেখ তাঁর সুক্ষ পর্যবেক্ষণের প্রকাশ। চতুর্দশ শতাব্দী মাধব কন্দলীর সমসাময়িক আসাম ছিল কৃষিভিত্তিক। তাদের খাদ্যাভ্যাস প্রকৃতি ও স্থানীয় উপাদানের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রধান খাদ্য হিসাবে একাধিক স্থানে ভাতের উল্লেখ বর্তমান।

“মরিবো কটাৰ হানি নখাই ভাত পানী।”^{২২}

“আজি থাকি অনুগ্রহ করিয়ো আমাত।
পরিচ্ছেদা এক থাকে ভুঞ্জো আজি ভাত।।
রাময়ে বোলন্ত বাপ শুনियो অপোনে।
আজি দুয়ো ভাত খাইবো কালি খাইবো কোণে।।”^{১৬}
“ৰাম তৈত বন ফলক খাইবন্ত
মই ভুঞ্জিবোহো ভাত।।”^{১৭}

জলকেন্দ্রিক আসামের জাতীয় জীবনে বর্তমানের ন্যায় মধ্যযুগেও ভাতের সঙ্গে প্রিয় খাদ্য ছিল মাছ। চতুর্দশ শতকে মাধব কন্দলীর রচিত রামায়ণে অসমীয়াদের মৎস্য প্রীতির উপমা নিম্নরূপ -

“চিলে যে থাম্প দিয়া মাছক নিলেক।” (৩/২)^{১৮}
অথবা
“দোঙ্গাদুঙ্গি পাৰ বুঢ়াৰ হাতৰ চেঙেলি।” (৪/১৮)^{১৯}
অথবা
“সাগরত যেন মৎস্য মাৰিল মগৰে।” (৫/৩২)^{২০}
অথবা
“এক হাতে কোনে ধৰিবেক দুই শন।”^{২১}
অথবা
“ৰৌ মাছ দিলা চটকৰ কাকবলি।” (৩/২০)^{২২}

উপরিউক্ত বর্ণনার মাধ্যমে কবি আসামের জলাশয়ে প্রাপ্ত সহজলভ্য শাল (শল), রৌ (রুই), চেঙেলি (চেঙ মাছ) মাছের উল্লেখ তাঁর সমাজ বিচক্ষণতার সাক্ষ্য বহনকারী।

কবি কন্দলীর সমসাময়িক কালে বৈষ্ণব ধর্মীয় প্রভাব আসামের ভূ-খণ্ডে খুব বেশি প্রভাবশালী না থাকায় মাছ-মাংসাদির উল্লেখ প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। অযোধ্যা কাণ্ডে ভরতাদি স্বসৈন্যে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে অতিথি আপ্যায়নের চিত্র কিংবা লঙ্কাকাণ্ডে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গের বিবরণ অসমীয়াদের আমিশ প্রীতির পরিচায়ক।

“দীঘিসম থৈলন্ত নির্মল জলে ভৰি।
মৎস্য মাংস দ্রব্য থৈলা পরিপূর্ণ করি।।”^{২৩}
অথবা
“মহিষ বৰাহ ছাগল মাৰিয়া
থৈলা দৌলা দৌলি করি।
কোটি অসংখ্যাত ডাঙ্গর কলস
মদ্য ঝৰিবক ভৰি।।”^{২৪}

মধ্যযুগীয় আসামের জন-মানসে মদের ব্যবহার ছিল। কন্দলীর বর্ণনায় বর্তমানের ন্যায় তৎকালেও কলসীতে প্রস্তুত করা মদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে সে সময়ে নারীরাও যে সুরাপানে অভ্যস্ত ছিল মন্দোদরীর ও অন্যান্য রাক্ষস নারীদের সুরাপান চিত্রে বর্ণিত। সুন্দরকাণ্ডে সীতা অশেষকালে হনুমান -

“মুখ সঙ্গি চাহন্তে মদ্যৰ পাইল ঘ্রাণ।
বোলন্ত জানকী নুহিব হেন থান।।”^{২৫}

থেকে ফিরে এসেছে।

মাধব কন্দলী স্বজাতীর উদ্দেশ্যে কাব্য রচনাকালে পাঠক আকর্ষণের নিমিত্তে বাণ্মীকি বহির্ভূত বহু ফল-মূলের পরিচয় দিয়ে তৎকালীন আসামের নিজস্ব সম্পদের ইতিহাস রচনা করেছেন। কপি সৈন্যসহ রামাদির লঙ্কাযাত্রায় জঙ্গলের মধ্যে -

“মধুর সুগন্ধ নানা ফলৰ আলায়।।
অমৃত সমান সবে পকা ফল খাইল।
মনত হৰিষে সবে উদৰ ভৰাইল।।
কমলা কপুৰা কণ্টকি যে নারিকেল।
আম জাম্ব লেটেকু বেদৰী জৰা বেল।।
কৰদই আমৰা বসন্ত কেন্দু কল।
মধুৰি মুহৰি নানাবিধ পকাফল।।”^{২৬}

দুধ-দই, ক্ষীর-পায়েস, ঘি ইত্যাদি ছিল তৎকালীন আসামের প্রধান খাদ্য তালিকাভুক্ত। আর দুধ, চালের গুড়া, নারিকেল, ঘি দ্বারা প্রস্তুত করা পিঠা আসামের মূল সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহনকারী। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গকালে -

“মেৰুৰ সমান চৰাৰ কৰিয়া
খৰিকা জহাৰ পিঠা।।”^{২৭}

‘খৰিকা’ পিঠা আসলে আসামের জাতীয় সংস্কৃতি পরিচায়ক।

প্রাচীনকাল থেকেই পান সুপারি (তাম্বুল) আসামের খাদ্য তালিকাভুক্ত। মুখ শুদ্ধির এই আয়োজন আজও ঘরে-ঘরে বর্তমান। অতিথি আপ্যায়নের প্রথম সামগ্রী তাম্বুল ছাড়া অতিথি আপ্যায়ন অসম্পূর্ণ। সুদূর চতুর্দশ শতাব্দীতেও গুহক রামচন্দ্রের আপ্যায়নে তাম্বুল পরিবেশন করতে ভোলেননি -

“কৰ্পূৰ তাম্বুল যত বিবিধ ভক্ষণ।
ৰামৰ আগত কৰিলেক উপসান।।”^{২৮}

পোশাক পরিচ্ছেদ : মাধব কন্দলীর রামায়ণে নারী-পুরুষের নানান পোশাক পরিচ্ছেদ, অলংকার-প্রসাধনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে বেশির ভাগই নারীর। আদিকাণ্ডে জানকীর স্বয়ংবরসভা গমনের পূর্বে প্রসাধনের নানা প্রসঙ্গ অঙ্কন করেছেন কবি মাধবদেব। কবি যেন স্বহস্তে সীতাদেবীকে সুসজ্জিত করে অসমীয়া রাজকন্যাতে পরিণত করেছেন। নাকে তিলফুলের রত্ন, কপালে তিলক, নয়নে কাজল, কানে উজ্জ্বল কুন্তল, গলায় সাতথাক গলাপাতা হার, হাতে সোনার কঙ্কণ ও শঙ্খের বালা আঙুলে আংটি ও মাথার খোঁপায় রত্নখচিত মেখলা উজ্জ্বল হয়ে আছে। ক্ষণিকের জন্য বঙ্কল পরিহিতা এই সীতা দেবীকে বনগমনের পূর্বে পঞ্চাশত শাশুড়ি সহ কৌশল্যা নিজ হাতে অলংকৃত করেছে রাজরাণী রূপে -

“শাশু পাঞ্চাশতে পিন্ধাইলন্ত অলংকাৰ।
মুকুট কুন্তল গ্ৰীবে সাতেসরি হাৰ।।
নূপুৰ পাগৰি আনো অলঙ্কাৰ যত।
থানে থানে প্রতি প্রতি পিন্ধাইলা সমস্ত।।
কঙ্কন কুন্তল রত্নাঙ্গুলি আৰো কাঞ্চি।
সমস্ত শৰীৰ অলঙ্কাৰে নিলা খাঞ্চি।।”^{২৯}

মাধব কন্দলীর সমসাময়িক আসামে পূজা-পার্বণ বা শুভকাজে শুভবস্ত্র পরিধানের রীতি ছিল, রামের অভিষেকের পূর্বে কৌশল্যা শুভবস্ত্রে মঙ্গলাচরণে লিপ্ত ছিলেন। সধবা নারীদের মধ্যে বর্তমানের মতো সিঁদুর, আলতা, শঙ্খবালা পরার সংস্কার কবি তুলে ধরেছেন। তবে বিধবা নারীদের পোষাক যে ভিন্ন ছিল কন্দলী তা বলতেও ভোলেননি -

“শিখৰ সিঁদুর মোৰ খসাইলাহা প্রভুদেব
ৰাজযোগ্য আনো অলঙ্কাৰ।।”^{৩০}

নারীদের পোশাক-পরিচ্ছেদের পাশাপাশি কবি পুরুষদের সাজ-সজ্জার আভাস দিয়েছেন, রাজা ও রাজকুমারদের সজ্জা ছিল -

“অগৰু চন্দন কস্তুরী কুঙ্কুমে
ভূমিলেক সবে গাবে।

যনানবিধ দিব্য রত্ন অলংকার
পিন্ধিলেক ঠাবে ঠাবে।।
পাট পটেৰেণে বিচিত্র বসনে
ভৈল আতি জাতিস্কাৰ।
সুবৰ্ণৰ মালা শিরত চরায়া
হৰিষৰ নাহি পাৰ।।”^{৩১}

ঋষি-মুনি-তপস্বীদের পোষাক যে ভিন্ন ছিল তা রামাদির রাজবস্ত্র ত্যাগ করে বঙ্কল পরিধানের চিত্রে নিহিত। মুনি পরশুরামের পোষাকের বিবরণের মধ্যেও কবি বুঝিয়েছেন -

“শিৰে জটাভাব গলে ৰুদ্রাঙ্গৰ মালা।
কটিত বাকল বস্ত্র কুশৰ মেখলা।।”^{৩২}

মেখলা কিন্তু আসামের জাতীয় পোশাক। শরীরের নিম্নাংশ ঢাকার জন্য। যদিও বর্তমানে এই পোশাক নারীদের জন্য নির্ধারিত। তবে মাধব কন্দলীর উল্লেখের মাধ্যমে বোঝা যায় তৎকালে পুরুষরাও পরতো। অরণ্যকাণ্ডে সীতা-হরণের জন্য রাবণরাজার সন্ন্যাসী বেশ ছিল এইরকম -

“মেৰাইলেক গাবত কপিন এক বস্ত্র।
পানৈত চরিল সিটো কন্ধে এক ছত্র।।
কাখে জুলি কস্থা কমন্ডলু ধৰি হাতে।
মাথাত ৰুদ্রাঙ্গ মালা তপস্বী সাক্ষাতে।।”^{৩৩}

ধৃতি তৎকালের আসামের জনগণ পরিধান করত। মাধব কন্দলীর বর্ণনানুযায়ী হনুমান রাবণরাজার বাসগৃহে ব্রাহ্মণ বেশে প্রবেশকালে তার পরিধানে ছিল -

“ধৃতি কৰন্তী তামি চবকি বোকন্তী থৈয়া
চরিতাহা বৃক্ষের উপরে।।”^{৩৪}

পুরুষদের যুদ্ধযাত্রায় সজ্জা ছিল ভিন্ন। রাক্ষস বীরদের যুদ্ধ সজ্জার মাধ্যমে মাধব কন্দলী দেখিয়েছেন যুদ্ধকালে যুদ্ধকবজ পরার রীতি। জাম্বুবানকে যুদ্ধকালে লাল কাপড় কপতে দেখা গিয়েছে। কন্দলী কবির নারী-পুরুষের পোশাক সজ্জার তথ্য এইভাবে তুলে ধরা তাঁর সমাজ অণুবীক্ষণ শক্তির পরিচয়। এই সাজ-সজ্জার অনেককিছু বান্ধ্যিকি রামায়ণে অনুল্লেখ্য হলেও বর্তমান আসামে আজও প্রচলিত।

আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব : প্রাচীনকাল থেকেই আসামের মানুষেরা নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ যত্নবান। সংস্কৃতির মাধ্যমেই মানুষ তার ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে। চলমান ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে চলে মানুষের জীবনধারা। জীবনের তিনটি ধাপ জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের মাধ্যমে সমাজ-সংস্কৃতির চিত্রটি উদ্ভাসিত। মাধব কন্দলী রামায়ণে জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত আচার, বিশ্বাস-সংস্কার, উৎসব-অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে আসামের সংস্কৃতি পরিবেশিত।

মাধব কন্দলী রামায়ণে বিবাহ, মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত আচার-অনুষ্ঠানের বহু চিত্র অঙ্কিত। জন্মের সঙ্গে জড়িত আচার-অনুষ্ঠানাদি কম থাকলেও আদি কাণ্ডে মাধবদেব দ্বারা রামাদির জন্মের বিভিন্ন আচার চিত্রিত। দশরথ পত্নীগণ কৌশল্যা-কৈকেয়ী-সুমিত্রাদির গর্ভকালীন পঞ্চম মাসে শুভদিনে ঘি, মধু ও পঞ্চামৃত ভোজন এবং অষ্টম মাসের শুভলগ্নে বিভিন্ন দ্রব্যাদি দ্বারা পুত্রলাভের (পুংসবণ) জন্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। রামাদির জন্মের পর -

“নানা নৃত্য গীত বাদ্য শব্দ তুমুল।।
সুগন্ধ শীতল জলে মিশুক ধোরাইল।
দুগ্ধ দিয়া সুকোমল শয্যাত গুৱাইল।।”^{৩৫}

শিশু জন্মের পরবর্তী ক্রিয়া-কলাপ প্রতিটি জাতি-উপজাতির মধ্যে বর্তমান। কবি এখানে তৎকালীন আসামের উচ্চবিত্ত সমাজের সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে প্রকাশ করেছেন।

রামায়ণের আদিকাণ্ডে রামাদি ও সীতাদেবীর নামকরণ অনুষ্ঠান বর্ণিত। বেদবিধি অনুসারে গণনা করে রাজা দশরথ ও জনক রাজা ব্রাহ্মণ, মুনি, ঋষি সকলকে পরমান্ন, পঞ্চগম্বত ভোজন করিয়ে পুষ্প, অগুরু চন্দন, দিব্য বস্ত্র, অলংকার, স্বর্ণ, হস্তী, ঘোড়া, রথ, দোল, দাস-দাসী, দেশ দ্বারা আপ্যায়ন করেছেন। রাজাদের দান-ধ্যানের অনুষ্ঠান থেকে নট-নটী, ভাট, তেলী-মালী, দুঃখী ভিক্ষুক কেউই বাদ পরেনি, অন্ন-বস্ত্র-অলংকারে তারা হয়েছে ধন্য।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিবাহ কেবল দুটি মানুষের মিলন নয়, এটি দুটি পরিবার এবং তাদের সংস্কৃতির মধ্যে একটি পবিত্র আধ্যাত্মিক বন্ধন। ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী এই পরম্পরা মাধব দেবের রচনায় বর্তমান। রামাদির বিবাহের সুক্ষাতিসূক্ষ চিত্র বর্ণনায় আসামের সংস্কৃতিতে তৎকালীন রাজ পুরিবারের বিবাহের চিত্র দীপ্তিময়। বিবাহ সভায় নৃত্য, গীত, মৃদঙ্গ ধ্বনি মুখরিত। ব্রাহ্মণ কন্যাগণ বৈদিক মঙ্গলাচরণে ব্যস্ত। বর-কণের স্নান সমাপ্তে দিব্য বস্ত্র-অলংকারে ভূষিত করেছে। এরপর -

“বিবাহের লগ্ন আসি ভৈল অনন্তরে।

জানি পাচে হরিষে জনক নৃপবরে।।

কন্যা সম্প্রদান করিবাক বসিলন্ত।।”^{৩৬}

মিথিলাতে বিবাহের সমস্ত মঙ্গলাচরণ সম্পন্ন করে রাজা দশরথ যখন পুত্র-পুত্রবধূ সমেত অযোধ্যাতে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন অযোধ্যা নগরী সুসজ্জিত পুষ্পে, প্রদীপে, চন্দনে, তাম্বুল-ফলমূলে। পতাকা, তোরণ, ধ্বজা চারিদিকের শোভা বর্ধিত করেছে। কবি মাধব কন্দলী নব বর-বধূর আগমন অসমীয়া সংস্কৃতির মাধ্যমে করেছেন -

“রাম সীতা আগমন দেখি সর্বলোকে।

থানে থানে উরুলি পারয় জাকে জাকে।।

কেহো নৃত্য করে কেহো আনন্দ বধার।

নটীসবে নাচয় করিয়া ভঙ্গীভাব।।”^{৩৭}

অযোধ্যার নারীগণ রাজপথে সুক্ষবস্ত্র (রেশমি) বিছিয়ে, বাসগৃহে ঘটস্থাপন করে সাংস্কৃতিক মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে বর-বধূদের বরণ করেন। সীতাদি নববধূরা তাদের শাশুড়ি ও গুরুজনদের প্রণাম পর্ব সম্পূর্ণ করলেন। গুরুজনদের প্রতি সীতাদির শ্রদ্ধা প্রদর্শন আসলে ভারতবর্ষের চিরকালীন সংস্কৃতি। এ বিষয়ে মাধব কন্দলী রামায়ণের গবেষক ডঃ স্বাতী কিরণ লিখেছেন-

“চতুর্দশ শতকে মাধব কন্দলী তার রামায়ণে পারিবারিক ভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে আসামের মানুষকে এক সংকীর্ণ বিশ্ববীক্ষা থেকে মুক্ত করে ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও ভূগোল সাথে পরিচয় করিয়েছেন।”^{৩৮}

রামায়ণের প্রধান বিষয় রাজ-রাজত্ব। রাজত্বে রাজসিংহাসন পরিবর্তনশীল। পিতার পর পুত্রের পরাজিত রাজার পর বিজীত বাজার, মাধব কন্দলীর রামায়ণে নতুন রাজার অভিষেকের চিত্র বিভিন্ন স্থানে উপস্থাপিত। কিস্কিন্দাকাণ্ডে বালীকে হত্যা করে রামচন্দ্র সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষেকের মধ্যে আছে নানান লৌকিক আচার।

“সুবর্ণের অষ্টঘট অগুরু সুগন্ধি জলে

ভরি আমডালি দিল ফল।

পণ্ডিত সকলে খড়ি ধরি শুভলগ্ন করি

শুভদিন চাই শুভক্ষণ।”^{৩৯}

লঙ্কাকাণ্ডে রাবণরাজের মৃত্যুর পর বিভীষণকে রামচন্দ্র রাজা ঘোষণা করে লঙ্কার রাজত্ব অর্পণ করার চিত্রটি এইরকম -

“এরে বিভীষণে নৃপতি ভৈলন্ত

খন্ডিলা দুখ ললাট।।

সুবর্ণ পাটত বসিলন্ত রাজা

বেড়িলা পাত্র মন্ডলে।

অভিষেক বঙ্গে কবীলা লখাই
সুৰ্ণ ঘটর জলে।।”^{৪০}

অযোধ্যা কাণ্ডে রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে রাজত্ব অর্পণ করার বাসনায় অভিষেকের নানান ব্যবস্থা করলেও তা পূর্ণতা পায়নি। কিন্তু লঙ্কাকাণ্ডের শেষাংশে মাধব কন্দলী রামচন্দ্রের রাজ্য অভিষেকের সুন্দর সুবৃহৎ বর্ণনা দিয়েছেন। চার সাগরের, পঞ্চাশ তীর্থজলে রাম-সীতাকে স্নান করিয়ে, সুন্দর পটুবস্ত্র পরিয়ে নানা ফলমূলে, ঘি, অগ্নি, বেদ-বাদ্য, সুগন্ধ, চন্দন, স্বর্ণের পদ্মমালা দ্বারা -

“বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি বিশ্বামিত্র
বীতিহোত্র পরাশর।
কাত্যায়ন ভর দ্বিজ রামদেব
আদি মুনি নিবন্তর।।”^{৪১}

রামচন্দ্রের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ব্রাহ্মণ ও সাধারণ প্রজাসকল ও সেনা-সামন্তদের দান-ধ্যান ও পুরস্কৃতের মাধ্যমে। কন্দলী রামায়ণে রাজাদের অভিষেক বর্ণনা প্রসঙ্গে ডঃ বিজয় বরুয়ার একটি মত খুবই প্রাসঙ্গিক -

“যুদ্ধ শেষে বিজয়ী রাজা নগরে ফিরে এলেও উৎসব অনুষ্ঠিত হত। এই উৎসবের বর্ণনায় মাধব কন্দলীর মৌলিকত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই উৎসব চলাকালীন ‘উরুলি জোকার’ (উলুধনি) কে শুভ বলে মনে করা হয়। রাজ্যভিষেক ও বিজয় উৎসবের বর্ণনার প্রসঙ্গে মাধব কন্দলী মূল রচনা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন বলে মনে হয় এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা বা রাজপুত্রের অভিষেক উৎসবের বাস্তবসম্মত বর্ণনা দিয়ে সেগুলোকে সমৃদ্ধ করেছেন।”^{৪২}

ডঃ বিজয়ার এই অভিমত বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য। বৈদিক সংস্কৃতির পাশাপাশি সেই সময়ের আসামের লৌকিক মঙ্গলাচরণগুলিকেও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা কবির সমাজ অণুবীক্ষণ ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ।

জীবনের সর্বাধিক সত্য প্রবচন মৃত্যু। প্রতিটি সমাজে মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত থাকে একাধিক সংস্কার-সংস্কৃতি। দার্শনিক কবি কন্দলীর কাব্যে দশরথ, বালী রাবণ রাজাদের ও অসংখ্য সৈন্য-সামন্তের মৃত্যু পরবর্তী ক্রিয়াকলাপে তা দৃশ্যমান। প্রাচীনকালে হিন্দুধর্মের দাহ-অনুষ্ঠানের সম্যক চিত্র অযোধ্যাকাণ্ডে রাজা দশরথের মৃত্যু পরবর্তী ক্রিয়ার মাধ্যমে কবি তুলে ধরেছেন -

“তৈলহন্তে নৃপতিক তুলিলন্ত কোলে।
দুইভাই নিয়া থাপিলন্ত চতুর্দোলে।
অগরু চন্দনে দেখা ভূষিত করাইল।।”^{৪৩}

অসমীয়া হিন্দু সমাজে আজও মৃতদেহকে সুসজ্জিত করার রীতি আছে। মাথায় মুকুট কুন্ডল পরিয়ে, দশরথকে হিন্দুধর্মের নিয়মানুসারে চন্দন চিতার উপরে উত্তরদিকে মাথা স্থাপন এবং দেহের উপর ও চারিদিকে যোগ্যপাত্রের সাজিয়ে পারদর্শী ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রীয় ত্রি-অগ্নিতে শ্রব (বিশেষ চামচ) দ্বারা ঘটাহুতি করার চিত্র কন্দলী অঙ্কণ করেছেন। অন্যদিকে ভরতাদি দ্বারা জলদান ও অস্থি সংসহ, দশ পিণ্ডদান, একাদশ-দ্বাদশ দিনে শাস্ত্রীয় কর্ম এবং ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে দানধ্যানের মাধ্যমে। ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা মনে করেন দশরথ ক্ষত্রিয় ছিলেন সেজন্য ত্রয়োদশ দিনে তাঁর শ্রাদ্ধের কর্ম হয়েছিল।

বালীরাজার মৃত্যুর পর দাহকার্য সম্পন্ন করেছে পুত্র অঙ্গদ ও আত্মীয় পরিজনবর্গ। পুত্র অঙ্গদ ও ভাই সুগ্রীব তাকে দোলাতে করে নদীর কোলে নিয়ে গিয়ে দন্ডকাষ্ঠ (দাঁতন) এবং কাক বলি (কাককে অন্ন উৎসর্গ) এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয় অঙ্গ হিসাবে পবিত্র স্নান ও তর্পণাদি করেছেন।

“আদে পিতৃ দিলা পিণ্ড জলাঞ্জলি।।”^{৪৪}

বালির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণনাতে মাধব কন্দলী প্রাচীন আসামের সংস্কৃতি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে জনমানববোধের পরিচয় দিয়েছেন।

হিন্দুধর্ম অনুসারে পিতার দাহকার্য করার অধিকার পুত্র সন্তানের, বালীর একমাত্র পুত্র অঙ্গদ তাই এই ক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন কিন্তু রাবণের কোনো পুত্র জীবিত না থাকায় রামের আদেশ অনুসারে বিভীষণ রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করেছেন -

“ঘৃত মিসলায়া যেন পশুগোট হুণে।

মুখাঙ্গিক দিলন্ত কনিষ্ঠ বিভীষণে।।”^{৪৫}

রাবণরাজ শত্রু হলেও সে ছিল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, রামচন্দ্রের আদেশে সেজন্য বিভীষণ ও লঙ্কার প্রজারা পূর্ণ রাজকীয় মর্যাদায় বৈদিক আচার মেনে প্রচুর ঘি, পবিত্রজল ও মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে শেষকৃত্য সম্পন্ন করেছেন -

“মুখত থাপিলা সাত সাগরের জল।।

রাজগুরু ব্রাহ্মণর শরীবে নসহে।

অগণিত মৃত দেন্ত অতি বর স্নেহে।।”^{৪৬}

এই শবদাহের চিত্রের মধ্যে আসামের লোকায়ত জীবন প্রতিফলিত।

বিশ্বাস ও সংস্কার : মাধব কন্দলী তার রামায়ণ কাব্যে লোক জীবনের চিত্র অঙ্কণ করতে গিয়ে সমাজমানসে প্রচলিত লোকবিশ্বাস সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস খুব সূক্ষ্ম বাস্তবসম্মত চিত্র ফুটিয়ে তুলছেন। বাল্মীকির রামায়ণের দেবত্বকে পাশে রেখে, কবির কাব্যটি চতুর্দশ শতাব্দীর অসমীয়া গ্রামীণ সমাজের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার-কুসংস্কার, অলৌকিকতার ছোঁয়া স্পর্শ করেছে।

গ্রহ-নক্ষত্রের উপর ভাগ্যের ভালো-মন্দ, বিচার-বিশ্লেষণ প্রাচীনকাল থেকে আসামের লোকজীবনে সঙ্গে যুক্ত। কন্দলী রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে রামের বনবাস যাত্রাকালে এবং দশরথের মৃত্যু প্রসঙ্গে তা উঠে এসেছে। রাজা দশরথ তার গ্রহ-নক্ষত্রের স্থান সম্বন্ধে বলেছেন -

“দুই গ্রহ মন্দ মোর বাহুরে মঙ্গলে।

দৈবজ্ঞে গণিয়া মোত কহিল সকলে।।

হেন উপক্ষাঘাতত রাজার কাল হয়।

প্রজার অনিষ্ট আসি মিলিল নিশ্চয়।।”^{৪৭}

দশরথের এই জ্যোতিষ গণনা এবং তার উপর নির্ভরতা রামচন্দ্রর অভিষেকের দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে -

“কালি শুভ দিনত তোমাক দিবো রাজ।।”^{৪৮}

কন্দলীর রামচন্দ্র বনবাসের আদেশ পেয়ে বিচলিত কৌশল্যা ও লক্ষ্মণকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে এটা তার বিধির লিখন, পৌরুষের থেকে দৈবশক্তি বা কপালের লিখন অনেক শক্তিশালী। কৈকেয়ী বা দশরথের এখানে দোষ নেই, দোষ আছে গ্রহের ফের বা ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসের কারণ অভিষেকের ঠিক পূর্বমুহুর্তে বনবাসের আদেশ প্রাপ্তি বিধাতার অলঙ্ঘ্য লিখন -

“মোর বিধি লিখিতেক বার্ষিতে নোরাবি।

রাজ্যশ্রী এৰিলোহা আপন ওরাবি।।”^{৪৯}

কন্দলীর রামচন্দ্র একজন সাধারণ মানুষের মতো সুখ-দুঃখের আবর্তনকে মেনে নিয়ে সিংহাসন ত্যাগ ও চিরবস্ত্র পরিধান কপালে থাকা একটি নির্ধারিত পরীক্ষা হিসাবে মেনে নিয়েছেন, আর এখানেই মাধব কন্দলীর সাফল্য, কারণ তাঁর উদ্দেশ্যেই ছিল দেবত্বকে সাধারণ মানবের আলোকে প্রকাশ করা।

মানবের জীবনে স্বপ্নের শুভ-অশুভ ব্যাখ্যা করা হয়, এই ধরনের স্বপ্নের অনেক ব্যাখ্যা কন্দলী রামায়ণে বর্তমান। অযোধ্যাকাণ্ডের শুরুতে রাজা দশরথের একটি স্বপ্নের মাধ্যমে বুঝতে পারেন তাঁর মৃত্যু, রাজ্যের বিনাশ আসন্ন সেজন্য তিনি রামের অভিষেকের ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করেছিলেন। রাজার স্বপ্নটি ছিল -

“স্বপ্নকে দেখিয়া বিচলিত মোর চিত্ত।

ভূমিকম্পে নির্ঘাত পরিল পৃথিবী।।”^{৫০}

রাজা দশরথের মৃত্যুর পর পুত্র ভরত মাতুলালয়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন -

“আকাশ ছানিয়া দেখিলো সম্পূর্ণ
পরিচয় চন্দ্র ভূমিত।
আরও দেখিলো সাগর শুকাইল
রাহুরে গ্রাসিল সূর।”^{৫১}

ভরত স্বপ্নে দেখেছিল দশরথ মলিন বস্ত্রে পর্বতের উচ্চশিখর থেকে গোবরের জলাশয়ে পড়ে যাচ্ছেন, তিলের তেল পান করছেন এবং উন্মত্তের মত হাসছেন। আসামের মানবের বিশ্বাস আছে স্বপ্নে তিল তেল পান করা অশুভের প্রতীক। ভরত স্বপ্নে আরও দেখলো দশরথ লোহার সিংহাসনের আরোহী হয়ে গাধাটানা রথে করে দক্ষিণ দিকে গমনরত। লোহার সিংহাসন আসলে মৃত্যুর আসন ও দক্ষিণদিক অর্থে যমপুরীর নির্দেশিকা। এই ভয়াবহ স্বপ্নের পরই ভরত অযোধ্যা থেকে আগত দূত দ্বারা পিতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করেন।

কিষ্কিন্দ্যাকাণ্ডে সুগ্রীব দ্বিতীয় বার বালীরাজকে বধ করতে আসার সংবাদ শুনে তারা বালীকে বারংবার যুদ্ধে যেতে বারণ করেছেন। কারণ তিনি চারিদিকে অশুভ লক্ষণ ও পূর্বরাতে তার দেখা স্বপ্ন স্বামীর কাছে ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যদিকে সুন্দরকাণ্ডে সীতা অশোক বনে অবস্থানকালে স্বপ্নে বুঝতে পেরেছেন রামের আগমন ও শীঘ্র তার দুঃখের দিন শেষ হবে।

লঙ্কাকাণ্ডে কবি মাধব কন্দলী দ্বারা অঙ্কিত দুটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দ্বারা বোঝা যায় রাবণরাজের দিন সমাপ্তকরণের। প্রথম স্বপ্নটি বিভীষণের কন্যা তিজটা দেখেছেন যে রাম-লক্ষণ হাতির দাঁতের তৈরি পালকিতে লঙ্কা আগমনের, রাবণ তেল মেখে নেড়া অবস্থায় গাধার পিঠে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছেন। লঙ্কা নগরী পুড়ে ছাই হয়ে সমুদ্রে নিমজ্জিত। এই স্বপ্নের পরেই রাবণের দেখা স্বপ্নটি না উল্লেখ করলেই নয়, রাবণ স্ব-স্বপ্নে দেখেছেন যে তার মাথার মুকুট মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি, চারিদিকে শিয়াল-শকুনের চিৎকার আর রাবণরাজ গাধায় টানা রথে দক্ষিণ দিক গামী (যমের ঘর)।

পশু পাখির ডাক, তাদের পতন শুভ-অশুভ সংবাদ বহনকারী। মাধব কন্দলীর সমাজ দার্শনিকতায় এই লক্ষণগুলি চিত্রিত। রামায়ণের ভিন্নাংশে কিষ্কিন্দ্যাকাণ্ডে বালীর যুদ্ধ যাত্রাকালে -

“বাধাক নুশুনি বালী সমরক যায়।
মাথার ওপরে কাক শগুণ বর্ণায়।।
বামপাশে সর্প যায় ডাহিনে শৃগাল।
কাক গৃধ্র পাখীর আকাশে কোলাহল।।”^{৫২}

রাবণের মৃত্যুর সময়ও মাধব কন্দলীতে এধরণের বর্ণনা পাওয়া গেছে -

“রাবণের উপরে মন্ডলি কবে কাক।
দক্ষিণ দিশত গৃধ্র ভ্রাম জাকে জাকে।।”^{৫৩}

অন্যদিকে খরের যুদ্ধ যাত্রাকালে -

“খর মহাবীর যবে যুদ্ধক চলিল।
রথের উপরে তার শগুণ পরিচয়।।”^{৫৪}

মাধব কন্দলীর রামায়ণে লোকবিশ্বাস ও সংস্কার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একটি বিষয়ের উপর আলোকপাত না করলেই নয় সেটি হল যাদুবিদ্যা। প্রাচীনকাল থেকে আসামের জনমানবের মধ্যে যাদু-টোনা ওঝা-গুণীনের প্রতি বিশেষ বিশ্বাস লক্ষণীয়। কন্দলীর লঙ্কাকাণ্ডে এর প্রকাশও দৃশ্যমান। ইন্দ্রজিত রাম-লক্ষণের সঙ্গে যুদ্ধকালীন তার যাদুবিদ্যা দ্বারা রাম-লক্ষণকে নাগপাশে বন্দী করা - “নাগপাশে দুয়ো ভাইক করিলেক বন্দী।”^{৫৫} মায়াবলে রামের প্রধান সৈন্যদের বিদ্ধ করে, রাম-লক্ষণকে শরবিদ্ধ -

“রাম লক্ষণক বিদ্ধিলেক শরঘাবে।”^{৫৬}

অন্যদিকে তৃতীয়বার যুদ্ধ যাত্রাকালে মায়াসীতা বধ করা আসলে তৎকালীন সমাজের ভূত-প্রেত, অপদেবতা, তান্ত্রিকতাকেই উপস্থাপনা। এ বিষয়ে কন্দলী রামায়ণের গবেষক ডঃ বিরিঞ্চি কুমার বরুয়ার একটি অভিমত আমরা প্রকাশ করতে পারি-

“কন্দলীর কাব্যে বর্ণিত রাক্ষসদের মায়াবিদ্যা বা যুদ্ধক্ষেত্রের অলৌকিক ঘটনাগুলো আসলে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাচীন কামরূপী যাদুবিদ্যা ও ওঝা-গুণীনদের তন্ত্রমন্ত্রের প্রতি মানুষের লোকবিশ্বাসেরই একটি সাহিত্যিক প্রতিফলন।”^{৫৭}

শিল্প : মাধব কন্দলীর রামায়ণে শিল্পসংস্কৃতির দিকটি সুন্দরভাবে অঙ্কিত। কবি যেহেতু রাজ-পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্বাভাবিকভাবে এই বিষয়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যে প্রকাশিত। কন্দলীর সমসাময়িক কালে আসামে নৃত্য-গীতের বহু প্রচলন ছিল। গায়করূপে ‘ভাট’ এর উল্লেখ, নাচের ক্ষেত্রে নট-নর্তকীর উল্লেখ রামায়ণে দৃশ্যমান -

“নানা ভাব-ভঙ্গী কৰি বিদ্যাধরে নাচে গারে
অসংখ্য যোগান ভাট নট।।”^{৫৮}

সুন্দর কাণ্ডে সীতার বার্তা নিয়ে হনুমানের প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে -

“জাকে জাকে ঝিঙ্গ পাৰি ধেমালি কৰন্তু।
ছাপৰিৰ ছেৰে কতো আনন্দে নাচন্তু।।”^{৫৯}

বর্তমান আসামেও ছাপরির ছেঁৰে নৃত্য করার পরম্পরা বহমান।

নট-নটী সকল নৃত্য করে অর্থ উপার্জন করত, এটা বৃত্তিরূপ পেশা। তবে সমাজে যে এদের বিশেষ সম্মান ছিল না তা বোঝা যায় সতীদেবী যখন বলেন -

“আমাক ইতৰ নাৰী সম দেখিলাহা।
নটৰ নটিনী যেন আনক বিলাহা।।”^{৬০}

অন্যদিকে কবির সমকালে সে পুতুল নাচের প্রচলন ছিল তা বোঝা যায় -

“নিশ্চলে থাকিলা যেন চিত্ৰৰ পুতলি।।”^{৬১}

বাক্যের মাধ্যমে।

শঙ্খ, পটহ, মাদল, ঢাক, ঢোল, কাংসতল, বীণা, বাঁশি ইত্যাদি বহু বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ দ্বারা বোঝা যায় তৎকালীন আসামে এগুলির প্রচলন। সুগ্রীবের অভিষেক কালে বহু বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ মাধব কন্দলীর বাস্তব অভিজ্ঞতার সম্ভার -

“বীৰ ঢাকঢোল বাজে ডবল ডগৰ দন্ডি
শব্দ শুনয় কোলাহল।
ভেমচ ফৈমচ চয়, বা ঝাৰ বমচি বাজে।
ৰামতাল আৰু কৰতাল।।
চৌকৰি কেন্দৰা ৰুদ্ৰ বিপক্ষি দোতৰা বাজে,
বাণী, বাঁশী দোশৰী-মহৰী।
জিজিৰি কাহালি শিঙ্গা ভেৰী ডাকে নিৰন্তৰ
স্বৰ্গ ভূবনকো গৈলা পুৰি।।”^{৬২}

মাধব কন্দলী রামায়ণে বহুবিধ বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ প্রসঙ্গে ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা লিখেছেন -

“বাদ্যযন্ত্রের প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে কিছু কেমনের অস্তিত্ব বাল্মীকির রামায়ণে, কিন্তু বেশিরভাগই পরবর্তী কালে ব্যবহৃত হওয়া বাদ্যযন্ত্র আর সম্ভবত মাধব কন্দলীর সময়ে সর্বত্র না হলেও রাজগৃহে এগুলি ব্যবহার হয়েছে তা ভাববার অবকাশ আছে।”^{৬৩}

মাধব কন্দলী রামায়ণের ভিন্ন স্থানে সমসাময়িক সমাজে ব্যবহৃত চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্যের আভাস দিয়ে ‘কবিসব নিবন্ধয় লোক ব্যবহারে’ উক্তিক সমর্থন করেছেন। কন্দলীর চিত্রিত অযোধ্যা নগরের ঘর-বাড়ির বর্ণনায় চতুর্দশ শতাব্দীর আসামে স্থাপত্য কলার পরিচয় বর্তমান। কবি রামের প্রসাদ নির্মাণ করেছেন -

“সুবৰ্ণৰ মান্ডলি চালত বনিয়াইছিল।
বৈদ্যুৰ্য্য ৰুবলি শুদ্ধ রজতে হিছাইল।।

রতনে খসিয়া সুবর্ণৰ পতা দিল।

সূচি কামি সমন্বিতে একত্ৰ কৰিল।।”^{৬৪}

এখানে উল্লেখিত ‘মান্ডলি’, ‘রুবলি’ কাদি ইত্যাদি আদি শব্দ দ্বারা কবি রামের প্রাসাদ যে আসামের নিজস্ব সম্পদ খেঁ, বাঁশ, কাঠ দ্বারা নির্মিত তা স্পষ্ট। বেত হল আসামের জাতীয় সম্পদ। কন্দলী কবির দ্বারা রামের প্রাসাদে বেতের অঙ্কিত বিভিন্ন চিত্র বর্ণনা আসলে -

“শঙ্কৰক দেখিল আছন্ত বৃষ মানে।

পাৰ্বতীক লেখি আছে সিংহৰ বাহনে।।

বিষ্ণুক লেখিলা গৰুডৰ স্বন্ধে আতি।

ডাহিনৰ লক্ষী বাম পাশে সৰস্বতী।।”^{৬৫}

আসামের চিত্রকলার উপস্থাপনা। এই বিবরণ বাল্মীকি রামায়ণে নেই, ইহা কবির নিজের সংযোজন।

সে সময়ে আসামের জঙ্গলে সহজলভ্য হাতির দাঁত এর দ্বারা নির্মিত কারিগরী শিল্প আসামে বিশেষ প্রচলিত ছিল।
তার বর্ণনা -

“হস্তি দান্ত বাৰ দিলা হিঙ্গুলৰ কাম।

কুন্দৰুম জালা থৈলা দেখি অনুপম।।”^{৬৬}

এই ধরনের তথ্য পরিবেশন আসলে প্রাচীন আসামের এক গৌরব রঞ্জিত অধ্যায়ের স্বরূপ প্রকাশ।

খেলা-ধূলা : মাধব কন্দলীর রামায়ণে প্রাচীন বেশ কিছু খেলার উল্লেখ আছে। সু’রকাণ্ডে রাক্ষসদের বিভিন্ন খেলা-ধূলার আকর্ষণীয় বর্ণনা এইরূপ -

“ভন্টাখেড়ি খেলারয় কতো খেলৈ ব্ৰুন্টি।

ঠারে ঠারে ক্ৰীড়া কৰে আকুটি ভাকুটি।।

ছরাল মেলেকসরে কৰে হাতাহাতি।

মালাবন্ধে যুজয় দেখিতে ভাল আতি।।

চোপ খেড়ি খেলারয় কতো খেলে লুনি।

গুরাল গুরালী খেলে সুললিত শূনি।।

ফলমূল ঢোকৰা আরৰ জরা পাশ।

দলি যুঁজ মেলে কতো লৰবি হতাশ।।”^{৬৭}

উপরে উল্লিখিত মালযুঁজ, চোপখেল, জয়া, পাশা ইত্যাদি আজও আসামের সমাজে বর্তমান।

তৎকালীন সমাজেও অবসর বিনোদনের বিভিন্ন মাধ্যম ছিল মাধব কন্দলী রামায়ণে তা উল্লেখিত। অরণ্যকাণ্ডে কুবেরের অনুচর ডম্বরুর উক্তি -

“বিবিধ বিনোদে আছিলোহোঁ তান পাশে।

ক্ৰীয়া কৌতুহলত অনেক কাল গৈল।।”^{৬৮}

অন্যদিকে রাজা-মহারাজারা যে শিকার করতে যেতেন তার পরিচয় রাজা দশরথ স্ত্রী কৌশল্যা ও সুমিত্রার কাছে পূর্ব স্বরণে অন্ধমুনির বৃত্তান্ত থেকে জানা যায়। প্রাচীন আসামে শিকার অবসর বিনোদনের একটি আনন্দ দায়ক প্রক্রিয়া ছিল।

ধর্ম : মাধব কন্দলীর রামায়ণের ধর্মবিশ্বাস প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার যে মাধব কন্দলীর নামে পরিচিত ‘সপ্তকাণ্ড’ অসমীয়া রামায়ণের আদি ও উত্তরকাণ্ড যথাক্রমে মাধবদেব ও শংকরদেব দ্বারা রচিত, ইহা ষোড়শ শতাব্দীর সংযোজন শ্রীশংকরদেব নিজে মাধব কন্দলীর রামায়ণ পড়ে তৃপ্তি অনুভব করতেন। হারিয়ে যাওয়া আদি ও উত্তর কাণ্ড সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব শিষ্য মাধবদেব ও নিজে গ্রহণ করে সমগ্র সপ্তকাণ্ড ‘রামায়ণ’-এর পূর্ণতা দিলেন।

মাধবদেব ও শংকরদেবের সংযোজনা যেহেতু ষোড়শ শতাব্দীতে, ষোড়শ শতাব্দীতে উত্তরপূর্ব ভারত-সহ আসাম হল বৈষ্ণব ধর্মীয় আন্দোলনের যুগ বৈষ্ণব ধর্মীয় আন্দোলনের সমসাময়িক প্রভাব স্বাভাবিকভাবে সেখানে থাকবেই, কিন্তু বর্তমানকালের অনেক গবেষক মনে করেন কন্দলীর রচিত অযোধ্যাকাণ্ড - লঙ্কাকাণ্ডে বিভিন্ন অধ্যায়ের ভিত্তিতে সংযোজনা পরবর্তীকালের। ডঃ বিরিশিঃ কুমার বরুয়া মনে করেন - “সেখানে উল্লেখিত শব্দ বা বর্ণনার মধ্যে সমসাময়িক সমাজের ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাস সম্বন্ধে মন্তব্য কার সমীচীন নয়।”

মধ্যযুগীয় বা প্রাক শংকরীয় যুগে আসামের প্রধান ধর্ম ছিল বৈষ্ণব, শৈব্য শাক্ত। বৈষ্ণব প্রভাব সমাজে ক্ষীণ প্রবাহমান হলেও ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে শংকরদেবের নেতৃত্বে আসামে যে বৈষ্ণব আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল তার বীজ ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে নিহিত ছিল। মাধব কন্দলী তাঁর কাব্যকে ‘দৈববাণী নয়’ ‘লৌকিক কথা’ বললেও তা ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত ছিল না। এই ধর্মীয় প্রভাবগুলিই আলোচ্য।

অযোধ্যা কাণ্ডে রামজননী কৌশল্যা দেবীকে দেখা গেছে বিষ্ণুর উপাসিকা রূপে। পিতা দশরথের কাছে রাজ্য অভিষেকের সুসংবাদ মাতাকে দিতে এসে রামচন্দ্র দেখেন দেবী কৌশল্যা -

“ঐকান্তিক ধ্যান মনে জগতের মার।

বিষ্ণুক পূজন্তে রাম নমিনন্ত পার।।”^{৬৯}

অন্যদিকে রাম-লক্ষণ বনগমনের দুঃসংবাদ মাতার কাছে পৌঁছাতে এসে দেখলেন -

“বিষ্ণু পূজন্তে দেখিলন্ত নিজ মা।

দুই ভাই মিলি প্রণমিলা তান পার।।”^{৭০}

অরণ্যকাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে মাধব কন্দলীর রামচন্দ্রকে ভগবান বা অবতার রূপে প্রকাশিত করেছেন। যেমন রামের হাতে মারিচ বধ কিংবা তুসুর নামক গন্ধর্ব বধ তাদের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তারা স্বর্গবাসী হয়েছে। বনবাসকালে অত্রিমুনির আতিথ্য গ্রহণকালে মুনি রামচন্দ্রকে ঈশ্বর বলে সম্বোধন করেছেন -

“আজিসি জানিলো মই জন্ম সাফিলিলো।

ঈশ্বর পাদপদ্ম সাক্ষাতে দেখিলো।।”^{৭১}

সীতাহরণের পর রামচন্দ্র সাধারণ মানবের মতো ভেঙে পড়েছিলেন দেখে লক্ষণ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে মনে করিয়েছেন তিনি পরম ঈশ্বর। সাধারণ মানবের এই লক্ষণগুলি তার জন্য নয়। তিনি বলেন -

“তুমিসে শংকর ব্রহ্মা তুমিসে দৈত্যারি।

নিমিষেকে ত্রিভুবন দহিবাকে পারি।।

আপুনি সঞ্চিলা ইটো সকলে জগত।

তাক সংহারিবা আরে কমন মহত।।”^{৭২}

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে জটায়ুকে রামচন্দ্রের বরদান এবং তার ভ্রাতা সম্পত্তির পুনরায় পাখা গজানোর কাহিনীর মধ্যে রামের অবতারত্বের প্রকাশ আছে। সুন্দরকাণ্ডে বিভীষণের রাবণকে হিতোপদেশ দেওয়ার প্রসঙ্গে কন্দলী কবি পদের গুরু করেছেন এইভাবে -

বিষ্ণুত ভকত গৈয়া মিলিল তহিতে।।”^{৭৩}

বিষ্ণুভক্ত বিভীষণ জানতেন -

“জানো মই সীতা লক্ষী জনক জিয়াবী।

আর জানো রাম মধুসূদন মুবাৰি।।”^{৭৪}

বালী বা রাবণকে বধ করার পর রামচন্দ্র নিজেই বলেছেন তাঁর হাতে মৃত্যু হওয়ার জন্য তাদের সদগতি প্রাপ্তি হয়েছে। লঙ্কাকাণ্ডের বিভিন্ন স্থানেও রামচন্দ্রের অবতারত্বের ছবি স্পষ্ট। রাবণের মাতামহ মাল্যবণ সীতাহরণের মতো গর্হিত কাজের নিন্দা করে বলেছেন -

“শ্রীরাম লক্ষণ নাৰায়ণ অবতার।

সাগরত সেতু বান্ধে শক্তি কাহার।।”^{৭৫}

সাধারণ মানুষের অপপ্রচার শুনে রামচন্দ্র সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষা নেন। জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশকালে ইন্দ্র বরুণ, মহাদেব, আদির সঙ্গে ব্রহ্মা এসে রামচন্দ্রকে মনে করিয়ে দেন তিনি পরম নারায়ণ ও সীতা হলেন লক্ষ্মী। সীতা হলেন পরম শুদ্ধা।

“অমোঘ স্তুতিক কবি ব্রহ্মাদের বুলিনন্ত

তুমি নাৰায়ণ মহা হৰি।।”^{৭৬}

আসামে বৈষ্ণব জাগরণের পূর্ব থেকেই বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব জনসমাজে বিস্তারিত থাকলেও শৈব এবং শাক্তধর্ম ছিল প্রভাবশালী। এ সম্বন্ধে ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ শর্মার মত হল -

“আসামে বৈষ্ণব জাগরণের পূর্বে বৈষ্ণব ধর্মের একটা ক্ষীণ দুর্বল ধারা প্রবাহিত ছিল, যদিও শৈব আর শাক্ত ধর্মের প্রাবল্য ছিল, কারণ এই দুটি ধর্ম আসামের প্রাচীন ধর্ম এবং আসামের অনার্যপ্রধান লোকসমষ্টির বিশ্বাসের অনুকূল ধর্ম। প্রাচীন আসামের রাজাদের বেশিরভাগই শৈব মতাবলম্বী ছিল।”^{৭৭}

অযোধ্যা কাণ্ডে বনবাসের আদেশ প্রাপ্ত রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতাদেবী যখন বলেন -

“পূর্বজন্মে নরাধিলো পার্বতী শঙ্কর।

কি কারণে মোক পরিহরে প্রাণেশ্বর।।”^{৭৮}

অথবা

“তুমি সমে চিত্রকুটে হৈবো আমি থিম।

গৌরী মহাদেবে যেনে কৈলাস গিরিত।।”^{৭৯}

এখন হর-পার্বতী প্রভাব সমাজে ভীষণভাবে ছিল তা বোঝা যায়। অন্যদিকে বনবাস যাত্রাকালে রামচন্দ্র নিজ মুখে যখন শঙ্করদেবকে আরাধনার পরামর্শ দান করেন তখন অনুমান করা যায় শৈব সম্প্রদায়ের সামাজিক ভিত্তি ছিল। কন্দলী কবি দেখিয়েছেন সাধারণ জনগণ রামচন্দ্রের বিদায়কালে ‘শিব’ ‘শিব’ উচ্চারণ করে তার পিছনে পিছনে যাত্রা করেছেন।

শাক্তধর্ম আসামের প্রাচীন ধর্ম। আসামবাসীর কাছে আজও কামাখ্যা মন্দির বিশেষ শ্রদ্ধেয়। বহু প্রাচীন এই শাক্ত ধর্মের প্রভাব মাধব কন্দলীর রামায়ণের বিভিন্ন স্থানে উপমা দ্বারা অঙ্কিত।

“কনৈয়ারী গঞ্জকাৰী প্রচণ্ডী চামুণ্ডী।”^{৮০}

“কৈলাসত দীপিত কৰন্ত যেন চণ্ডী।”^{৮১}

মাধব কন্দলী রামায়ণের ভিন্ন স্থানে চণ্ডী-রণচণ্ডী-চামুণ্ডী ইত্যাদি দেবীর উল্লেখ চতুর্দশ শতকের সমাজ মাঝে প্রচলিত ধর্মপূজার সাক্ষ্য বহনকারী। শাক্ত দেবীপূজা উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক সমাজে প্রচলিত বলিদান প্রথার চিত্রাঙ্কণ কবির সুক্ষ দক্ষতার প্রয়োগ। চতুর্দশ শতাব্দীতে আসামে হিন্দুধর্মের মিশ্রণ ঘটায় সময় প্রাচীন তান্ত্রিক রীতি-নীতি এবং স্থানীয় উপজাতীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণে বলিদানের আচারগুলো ধর্মীয় বৈধতা লাভ করে। মাধব কন্দলীর রামায়ণে এর উপস্থাপন করেছেন। -

“আমি ভৈলা কৈকেয়ীর অষ্টমীর ছাগ।”^{৮২}

অথবা

“কলিয়া ছাগল আনি মাথা ছেদ কৰি।

আহতিক করয় লোহর শ্রব ধৰ।।”^{৮৩}

এইভাবে প্রাচীন অসমীয়া সমাজের বিভিন্ন সমসাময়িক লোক উপাদান কাব্যে উপস্থাপন করে কবি মাধব কন্দলী তাঁর অনুবাদ গ্রন্থকে অসমীয়া সাহিত্যের জাতীয় কাব্যে পরিণত করেছেন।

মাধব কন্দলী রামায়ণে সমাজ সংস্কৃতির বিষয়বস্তুর উল্লেখ সম্বন্ধে দেবী গোস্বামী লিখেছেন -

“Madhava Kandali composed his Ramayana keeping his eye on the folk society of the time. The educated elite naturally took resort to the Ramanayan of Valmiki since they were proficient in Sanskrit. On the contrary the non-elite folk could not follow or understand the original Ramayana. Although Madhava Kandali always tries to remain

faithful to the original in respect of characterization and depiction of situations, nevertheless he did not forget to weave popular taste into his artistic web and dye in local colour.”⁸⁴

Reference:

১. বরুয়া দত্ত হরিনারায়ণ (সম্পাদ): সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড, পৃ. ২৯২
২. বরুয়া বিজয় : মাধব কন্দলীর রামায়ণত লোকায়ত জীবন, অন্তরীপ, পৃ. ৬
৩. বরুয়া দত্ত হরিনারায়ণ (সম্পাদ): সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড ৪৬৫
৪. প্রাগুপ্ত, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ. ১০৫
৫. প্রাগুপ্ত, লঙ্কাকাণ্ড, পৃ. ৩৭৮
৬. প্রাগুপ্ত, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ. ১৬২
৭. প্রাগুপ্ত, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ. ১৩৬
৮. প্রাগুপ্ত, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ. ১৩৬
৯. প্রাগুপ্ত, লঙ্কাকাণ্ড, পৃ. ৪৪৯
১০. প্রাগুপ্ত, অরণ্যাকাণ্ড, পৃ. ২০৯
১১. প্রাগুপ্ত, সুন্দরকাণ্ড, পৃ. ২৮৫
১২. প্রাগুপ্ত, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ. ১২৭
১৩. প্রাগুপ্ত, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ. ১২৭
১৪. প্রাগুপ্ত, লঙ্কাকাণ্ড, পৃ. ৪৪৯
১৫. প্রাগুপ্ত, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ. ১০৯
১৬. প্রাগুপ্ত, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ. ১২৯
১৭. প্রাগুপ্ত, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ. ১৩৪
১৮. প্রাগুপ্ত, অরণ্যাকাণ্ড, পৃ. ১৮৩
১৯. প্রাগুপ্ত, কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড, পৃ. ২৪৬
২০. প্রাগুপ্ত, সুন্দরকাণ্ড, পৃ. ৩০১
২১. প্রাগুপ্ত, লঙ্কাকাণ্ড, পৃ. ৩৫১
২২. প্রাগুপ্ত, অরণ্যাকাণ্ড, পৃ. ২২৮
২৩. প্রাগুপ্ত, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ. ১৬৭
২৪. প্রাগুপ্ত, লঙ্কাকাণ্ড, পৃ. ৩৭৩
২৫. প্রাগুপ্ত, লঙ্কাকাণ্ড, পৃ. ২৮৪
২৬. প্রাগুপ্ত, সুন্দরকাণ্ড, পৃ. ৩২০
২৭. প্রাগুপ্ত, লঙ্কাকাণ্ড, পৃ. ৩৭৩
২৮. প্রাগুপ্ত, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ. ১৩৭
২৯. প্রাগুপ্ত, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ. ১৩১
৩০. প্রাগুপ্ত, কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড, পৃ. ২৪৮
৩১. প্রাগুপ্ত, আদিকাণ্ড, পৃ. ৬৭
৩২. প্রাগুপ্ত, আদিকাণ্ড, পৃ. ৯৫
৩৩. প্রাগুপ্ত, অরণ্যাকাণ্ড, পৃ. ২১২
৩৪. প্রাগুপ্ত, সুন্দরকাণ্ড, পৃ. ২৯৮

-
৩৫. প্রাণ্ডন্ত, আদিকাণ্ড, পৃ. ৪৬
৩৬. প্রাণ্ডন্ত, আদিকাণ্ড, পৃ. ৯২
৩৭. প্রাণ্ডন্ত, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ. ১০৩
৩৮. Kiran Swati: Search for Indianness in Madhava Kandali Ramayana in Assamese : প্রকাশ
Journal of Applied Bioanalysis
৩৯. প্রাণ্ডন্ত, হরিনারায়ণ (সম্পাঃ) : সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড, পৃ. ২৫২
৪০. প্রাণ্ডন্ত, লঙ্কাকাণ্ড, পৃ. ৪৪৪
৪১. প্রাণ্ডন্ত, লঙ্কাকাণ্ড, পৃ. ৪৬২
৪২. বরুয়া বিজয়া : মাধব কন্দলীয় রামায়ণত লোকায়ত জীবন, অন্তরীপ, পৃ. ১১৪
৪৩. প্রাণ্ডন্ত, হরিনারায়ণ (সম্পাঃ) : সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ. ৫৭
৪৪. প্রাণ্ডন্ত, কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড, পৃ. ২৫১
৪৫. প্রাণ্ডন্ত, লঙ্কাকাণ্ড, পৃ. ৪৪৩
৪৬. প্রাণ্ডন্ত, লঙ্কাকাণ্ড, পৃ. ৪৪৩
৪৭. প্রাণ্ডন্ত, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ. ১০৫
৪৮. প্রাণ্ডন্ত, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ. ১০৫
৪৯. প্রাণ্ডন্ত, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ. ১১৮
৫০. প্রাণ্ডন্ত, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ. ১০৫
৫১. প্রাণ্ডন্ত, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ. ১০৫
৫২. প্রাণ্ডন্ত, কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড, পৃ. ২৪৫
৫৩. প্রাণ্ডন্ত, লঙ্কাকাণ্ড, পৃ. ৪৩৮
৫৪. প্রাণ্ডন্ত, অরণ্যাকাণ্ড, পৃ. ১৯৭
৫৫. প্রাণ্ডন্ত, লঙ্কাকাণ্ড, পৃ. ৩৫১
৫৬. প্রাণ্ডন্ত, লঙ্কাকাণ্ড, পৃ. ৩৯১
৫৭. বরুয়া বিরিশ্বিকুমার : অসমীয়া লোক-সংস্কৃতি, বীণা লাইব্রেরী, পৃ. ৫৬
৫৮. প্রাণ্ডন্ত, হরিনারায়ণ (সম্পাঃ) : সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড, পৃ. ২৫৩
৫৯. প্রাণ্ডন্ত, লঙ্কাকাণ্ড, পৃ. ৪৪৯
৬০. প্রাণ্ডন্ত, সুন্দরাকাণ্ড, পৃ. ৩১৩
৬১. প্রাণ্ডন্ত, লঙ্কাকাণ্ড, পৃ. ৪১১
৬২. প্রাণ্ডন্ত, কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড, পৃ. ২৫৩
৬৩. শর্মা সত্যেন্দ্রনাথঃ রামায়ণর ইতিবৃত্ত, বীণা লাইব্রেরী, পৃ. ২৬৪
৬৪. বরুয়া দত্ত হরিনারায়ণ (সম্পাঃ) : সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ. ১১১
৬৫. প্রাণ্ডন্ত, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ. ১১১
৬৬. প্রাণ্ডন্ত, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ. ১১১
৬৭. প্রাণ্ডন্ত, সুন্দরাকাণ্ড, পৃ. ২৮০
৬৮. প্রাণ্ডন্ত, অরণ্যাকাণ্ড, পৃ. ২৩০
৬৯. প্রাণ্ডন্ত, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ. ১০৫
৭০. প্রাণ্ডন্ত, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ. ১১৬
৭১. প্রাণ্ডন্ত, অরণ্যাকাণ্ড, পৃ. ১৮০
৭২. প্রাণ্ডন্ত, অরণ্যাকাণ্ড, পৃ. ২২৬

-
৭৩. প্রাণ্ডু, কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড, পৃ. ৩২১
৭৪. প্রাণ্ডু, কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড, পৃ. ৩২২
৭৫. প্রাণ্ডু, লঙ্কাকাণ্ড, পৃ. ৩৪১
৭৬. প্রাণ্ডু, লঙ্কাকাণ্ড, পৃ. ৪৫১
৭৭. শর্মা সত্যেন্দ্রনাথঃ রামায়ণের ইতিবৃত্ত, বীণা লাইব্রেরী, পৃ. ২৬১
৭৮. বরুয়া দত্ত হরিনারায়ণ (সম্পাদঃ): সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ. ১২৫
৭৯. প্রাণ্ডু, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ. ১২৫
৮০. প্রাণ্ডু, সুন্দরকাণ্ড, পৃ. ২৮৬
৮১. প্রাণ্ডু, লঙ্কাকাণ্ড, পৃ. ৪৬১
৮২. প্রাণ্ডু, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ. ১৪৩
৮৩. প্রাণ্ডু, লঙ্কাকাণ্ড, পৃ. ৩৯১
৮৪. Goswami Deva B. K: A critical study of the Ramayana tradition of Assam (upto 1826 A.D.)
Calcutta, Punthi Pustak, 1994, P. 172 – 173